হয়ে ওঠে—এ
কবি ধরতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ- "জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতার মহাপ্রকৃতির চরম সত্যই অভিব্যক্ত হয়েছে।"—আলোচনা করো।

উত্তর ঃ— বনলতা সেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কবি প্রকৃতির গভীর শান্তি অনুভব করেছেন। বনলতা সেনের কাছে কবির আশ্রয় স্থল দারুচিনি দ্বীপের ভিতর সৃষ্ট সবুজ ঘাসের দেশে। কবি লিখেছেন—

'অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর, তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'

সমালোচক লিখেছেন, 'সারাদিন ধরে পাখি রৌদ্রদগ্ধ হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তার জন্যও একটি নীড় অপেক্ষা করে থাকে, সন্ধ্যার ডানার রৌদ্রের গন্ধে মুছে ফেলে জোনাকি-জ্বালা অন্ধকারে নীড়ের গভীর প্রশান্তির কাছে ধরা দেয়। বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখে কবি নিরালম্ব জীবনে আশ্রয় ক্লান্তি জর্জর হৃদয়ে প্রশান্তির আশ্বাস পেয়েছিলেন। পাখির নীড় বনের লতায় তৈরি, সেই সুদূর সূক্ষ্ম সাদৃশ্য নায়িকার নামে ধরা আছে।' কতকগুলো খণ্ডখণ্ড আবেগ আকুলতার রসে অভিস্নাত আলোচ্য কবিতায় একদিকে কবি সমস্ত পৃথিবীর নির্জনতাকে ভালোবেসেছেন। 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' পৃথিবীতে। প্রকৃতির সেই সন্ধ্যায় 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। এক নির্জন নীড় তিনি অনুসন্ধান করেছেন, দারুচিনি দ্বীপের সবুজ ঘাসের ভিতর পরিপূর্ণ নির্জনতার সন্ধান করেছেন। প্রকৃতির অনন্তও থেকে আগত অজ্ঞাত দূর পৃথিবীর তন্দ্রাবিধুর আবেশ বিহ্বলতা কবিকে তখন নিয়ে গেছে দার্শনিকতার জগতে। কবির কাছে তখন প্রকৃতি নয়—মহাপ্রকৃতিই চরম সত্য হয়ে উঠেছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'কবি জীবনানন্দ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "নারী চিত্তে যাযাবর পুরুষের সংখ্যোচিত চিত্র আছে। তিনি মহাপ্রকৃতির সৃষ্টশক্তিরই এ একবিন্দু প্রতিমা রমণী হলেও তা-ই। নারী হলেও মহাপ্রকৃতি নর্তকী রমণী বই আর কে? কৃষ্ণের প্রতি রাধার যেমন আকর্ষণ পেট্রিয়াকী সভ্যতার, তেমনি

মাতৃকা-সভ্যতায় (গোপিনী-ধাত্রী-সভ্যতা) পুরুষের আকর্ষণ নারীর প্রতি। দুই সভ্যতারই ঐতিহ্য বহন করেছে ভারতীয় জীবন। 'বনলতা সেন' সাংখ্য-বোধ বা মাতৃকা সভ্যতার তন্ত্রীলয়ে সুর বেঁধেছে সুররিয়্যালিজম-এর ছবি বাঙালির পুণ্ডবর্দ্ধনে কেমন আঁকা যায় তাই দেখাচ্ছে। .....বাঙালীর বিদিশার রাত্রি থেকে একটু অন্ধকার তুলে এনে (বোদলেয়ারও এমন ভঙ্গি দেখিয়েছেন) কোশলের শিল্পশালার নর্তকীর মুখাবয়ব বসিয়ে, মালয়—সুমাত্রা যাত্রী বঙ্গ—নাবিকের বি-দিশা ও ভ্রান্ত কল্পনা করে মসলার দেশ থেকে একটু ঘাস কুড়িয়ে তার ভাঙা হাল সমেত প্রোথিত করে যে দৃশ্য-পট তৈরি, তেমন একটি গৃহান্ধকারের সাংসারিক ভ্রান্তে নাটোরের পক্ষীজাতীয় মেয়ে এক ক্লান্ত-প্রাণ নাবিককে কুশল পরিচয় জিজ্ঞাসা করছেন। এই সেনীয়া রমণী রমণঈ নাবিককে চোখের আহ্বানে পাখির নীড়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, যেহেতু তাঁর জন্মগত সংস্কার তাই। কিন্তু পরাভূত কোকিল ত জানে এ-নীড় তার নয় দু'দণ্ডের খেলা শুধু সন্তানের লালনের জন্যে এই ধাত্রী কাকিনী।''

জীবনানন্দ আলো আঁধারির জগতে বনলতাকে অনুসন্ধান করেছেন। জীবনের সব হিসেব নিকেশ—'সব লেনদনে' মিটিয়ে প্রেমের স্মৃতি নিয়ে বনলতার কাছে বসেছেন কবি। বনলতা তাঁর পরকালেরও সঙ্গী। অতীত নয়, বর্তমান নয়—ভবিষ্যতের কথাও এখানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এর আগেও কবি অনুভব করেছেন নক্ষত্রজগতের হাতছানি, ব্রাউনিঙের কবিতায় আছে—

'That out of three sounds he frame,
Not a fourth sound, but a star',

আবেগ নির্ভর সুদূর প্রকৃতির ছায়া কবির রোমান্টিক ভাবনায় মহাপ্রকৃতির আস্তরণ বিছিয়েছে—বর্ণালী চিত্রের বিন্যাসে বিচিত্র সব রঙের সুর অনুরণিত হয়েছে—

'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

সব পাখি ঘরে আসে-সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন; থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' জীবনানন্দ সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেছেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিকশিত হয়েছে তাঁর কবিমানস। একদিকে তাঁর জীবন সংগ্রাম শান্তি ও স্থিতির জন্য অন্যদিকে মানবাত্মার মর্মবেদনায় কবির মধ্যে জন্ম নিয়েছে গাঢ়তর বেদনা, তিনি 'সময় প্রকৃতির পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ' করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আর সেই দার্শনিক ধারণা থেকেই উঠে এসেছে 'বনলতা সেন' কবিতার সে, দুই চরণ। তাই সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন 'বনলতা সেন' কবিতায় মহাপ্রকৃতির চরম সত্যই অভিব্যক্ত হয়েছে।''

প্রশ্ন ঃ 'বনলতা সেনে'র শিল্প প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ জীবনানন্দ বাংলা ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাংলা করে তোলার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, ''সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙ্গালপনা করে আর কতকাল আমরা

মাতৃভাষাকে ছোটো করে রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন ব'লে মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাংলা ক'রে তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।" বক্তব্যে চমক আনার জন্য তিনি শব্দকে নানান ভাবে ব্যবহার করেছেন; যেমন 'বিদর্ভ নগরে', 'সমুদ্র সফেন', 'বিদিশার নিশা', 'শ্রাবস্তীর', 'দারুচিনি-দ্বীপের', 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ' ইত্যাদি।

শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি জীবনানন্দের ব্যবহৃত উপমাও লক্ষ্য করার মতোন। তাঁর ব্যবহৃত উপমাগুলি গভীর জীবনদর্শনের কথা ব্যক্ত করেছে। দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখেছেন, "কেবল দেশজ শব্দ দিয়ে সৃষ্টি বলেই জীবনানন্দের উপমা অনন্য সাধারণ নয়। তাঁর উপমাগুলি অনেক ক্ষেত্রে গভীর জীবনদর্শনকেও ব্যক্ত করেছে। এইজন্য বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—'তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দূরগন্ধবহ'। অর্থাৎ তাঁর উপমাগুলি কেবল চিত্র নয়, তাঁর চিন্তা। যেমন ঃ

বলেছে সে এতদিন 'কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'

এখনে উপমাটি তুলনাগত নয়, মনগত। চোখের রূপের নীড়ের শান্ত, স্নেহমমতাপূর্ণ আশ্রয় যেমন পাখির কাম্য, বনলতা সেনের চোখও তেমনি স্নেহমমতাময় আশ্রয়। এ উপমাকে উপলব্ধি করতে হলে তাই হৃদয় ওমন দিয়ে অনুভব করতে হবে।"

প্রধানত জীবনানন্দ তাম প্রধান ছন্দের কবি। আলোচ্য কবিতাটিও তানপ্রধান ছন্দে লেখা। মধ্য মিলেও কবি যথেষ্ট সুণ্ডীয়ানর পরিচয় দিয়েছেন।—

"চুল তার কবেকার অনুকার বিদিশার নিশা"।

এবার তানপ্রধান ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাক—

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

'বনলতা সেন' যথার্থ অর্থে আধুনিক কবিতা। 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, "একথা বাস্তবিকই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য ও ইঙ্গিত পেয়ে আজ যে আধুনিক কাব্যের ঈষৎ সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণাম—বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গয়ে দাঁড়াবে, সাহিত্যের ইতিহাস এরকম জ্ঞাত কুলশীল জিনিস নয়। ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে-যুগে ঘুরে ফিরে শেকস্‌পীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে—এই ধারণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখ নিতান্তই বিচারসাপেক্ষ বলে প্রমাণিত হবে না

এই আমার মনে হয়।'' রবীন্দ্রনাথের প্রেম চিন্তাই বিবর্তিত হয়ে নবরূপ নিয়েছে জীবনানন্দের কবিতায়। মানবের মৌল অনুভূতি হল প্রেম—যা রোম্যান্টিক ভাবপ্রবণতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আবার আধুনিক কবিদের বিশ্বাস, প্রেম একান্তভাবেই দেহ নির্ভর। আধুনিক কবিদের নারীরূপতৃষ্ণা এসেছে পাশ্চাত্ত্য রোম্যান্টিক যুগের শেলী, কীটস, বায়রণ প্রমুখ কবিদের সচেতন অনুসরণে। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতার কাছে কবির হৃদয়ের কামনীয়তার ছবি ভাষা পেয়েছে। ভাবালুতা যেমন আছে—কি তেমনই আছে কবির ঋজু দৃষ্টিভঙ্গি। দেহস্পর্শ মুখর নারীপ্রেমের অনুভূতি এবং অন্ধকারের চিত্রকল্পে কবিতা শেষ হয়েছে।

তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর ঃ—

(১) 'হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।'

(প্রথম স্তবক)

❑ পথ পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে কবির যাত্রা হয়েছে শুরু। জীবনানন্দের সময় চেতনা ইতিহাস চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাসের গতিমুখীনতা তাঁকে অস্থির কালশ্রোতের মুখোমুখি করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে কবি পৃথিবীর পথ পরিক্রমায় নিরত আছেন। সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে কবি অনেক ঘুরেছেন। বিম্বিসারে আশোকের ধূসর জগতেও তিনি একদিন ছিলেন। আরো অনেক দূরে বিদর্ভ নগরেও তিনি পথ হেঁটেছেন। সবশেষে কবির ক্লান্ত প্রাণে দু-দণ্ড শান্তির ছোঁয়া এনে দিয়েছে নাটোরের বনলতা সেন। 'বনলতা সেন'-এর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনানন্দের প্রেম হয়ে উঠেছে শরীরী অস্তিত্ব সম্পন্ন। কবি প্রেমের আদর্শকে আদর্শের বাষ্প সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে নাম ও পরিচয় বাজ করেছেন। কবিতার চরণ গুলোতে এক রোমাণ্টিক কুহক রচনা করেছেন—মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তির অতীত স্তরে—পরিচিত এক রহস্যময়তার জগতে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছে। কবি শুধু অতীত ইতিহাসের অন্ধকারে অবগাহন করে সেদিনের শিল্পের ও সৌন্দর্যের জগতেরই জাগরণ ঘটান নি, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নময় রূপকথার মায়ারাজ্যের এক ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।